بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ আগস্ট, ২০২১ মোতাবেক ২৭ যহুর, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত উমর (রা.)-এর বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচন অব্যাহত রয়েছে। তাঁর যুগে একটি যুদ্ধ হয় যাকে 'র‍্যা-এর যুদ্ধ' বলা হয়। র‍্যা একটি বিখ্যাত শহর যা পার্বত্য অঞ্চল। এটি নিশাপুর থেকে ৪৮০ মাইল দূরে এবং কাযভীন থেকে ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত। র‍্যা-এর অধিবাসীদের রাযী বলা হয়। প্রখ্যাত মুফাস্সেরে কুরআন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) র‍্যা-এর অধিবাসী ছিলেন। র‍্যা-এর শাসক ছিল সিয়াহোশ বিন মেহরান বিন বাহ্রাম শোবীন। সে দুম্বাওয়ান্দ, তবরিস্তান, কুমিস এবং জুরজানবাসীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায় এবং বলে, মুসলমানরা র‍্যা-এর ওপর হামলা করছে, কাজেই তোমরা তাদের মোকবিলার জন্য একত্রিত হও। অন্যথায় তোমরা এককভাবে তাদের সামনে কখনোই টিকে থাকতে পারবে না। অতএব অত্র অঞ্চলের সাহায্যকারী সেনারাও র‍্যা-তে একত্রিত হয়। মুসলমানরা তখনও র‍্যা-এর পথেই ছিল এমন সময় এক ইরানী সর্দার আবুল ফারখান যায়নবী সহযোগিতামূলকভাবে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়, যার কারণ ছিল সম্ভবত র‍্যা-এর শাসকের সাথে তার শত্রুতা। সেনাদল যখন র‍্যা-এ পৌঁছে তখন শত্রুর সংখ্যা এবং ইসলামী বাহিনীর সংখ্যায় কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এ অবস্থা দেখে যায়নবী নঈমকে বলে, আপনি আমার সাথে কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী প্রেরণ করুন, আমি গোপন পথ ধরে শহরের ভিতরে ঢুকে যাব আর আপনি বাইরে থেকে আক্রমণ করবেন, এভাবে শহর জয় হয়ে যাবে। অতএব নঈম বিন মুকার্‌রিন তার ভাতিজা মুনযের বিন আমরের নেতৃত্বে অশ্বারোহী সৈন্যদলের একাংশকে যায়নবীর সাথে পাঠিয়ে দেন আর অন্য দিকে তিনি নিজে সৈন্য নিয়ে বাইরে থেকে শহরের ওপর আক্রমণ করেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, শত্রুরা অত্যন্ত অবিচলতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে, কিন্তু যখন তারা নিজেদের পিছন দিক থেকে সেই মুসলমান সৈনদের স্লোগানের আওয়াজ শুনতে পায় যারা যায়নবীর সাথে শহরে প্রবেশ করেছিল তখন তাদের মনোবল ভেঙে যায়, ফলে শহরটি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। শহরবাসীকে লিখিতভাবে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। যে শব্দাবলীতে নিরাপত্তানামা লেখা হয় তা হলো 'বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম, এটি সেই অঙ্গীকারনামা যা নঈম বিন মুকার্‌রিন যায়নবীকে প্রদান করছে। তিনি র‍্যা এবং তাদের সাথী বাহিরের অধিবাসীদের এ শর্তে নিরাপত্তা দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক সাবালক সদস্য তার যোগ্যতা অনুসারে বাৎসরিক হারে জিযিয়া প্রদান করবে এবং সে কল্যাণকামী হবে, (মুসলমানদের) রাস্তা বলে দিবে, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করবে না এবং এক দিন ও এক রাত মুসলমানদের আতিথেয়তা করবে আর তাদের সম্মান করবে। যারা মুসলমানদের গালি দিবে তারা শাস্তি পাবে এবং যে তাদের ওপর আক্রমণ করবে সে হত্যাযোগ্য সাব্যস্ত হবে। যাহোক, এই চুক্তি লিখিত হওয়ার পর সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেয়া হয়।

এরপর রয়েছে কুমিস ও জুরজানের বিজয়, এটি ২২ হিজরী সনের (ঘটনা)। বার্তাবাহক র‍্যা-এর বিজয়ের সংবাদ হযরত উমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছালে তিনি (রা.) নঈম বিন মুকার্‌রিনকে লিখেন, আপনার ভাই সোভ্যাদ বিন মুকার্‌রিনকে কুমিস বিজয়ের জন্য প্রেরণ করুন। এটি র‍্যা এবং নিশাপুর শহরের মধ্যবর্তী তবরিস্তানের পার্বত্যাঞ্চলের শেষাংশে অবস্থিত ছিল। কুমিসের অধিবাসীরা কোন ধরনের প্রতিরোধ করে নি। ফলে সোভ্যাদ তাদেরকে শান্তি ও সন্ধিনামা লিখে দেন। এর সাথে ছিল তবরিস্তান ও খুরাসানের মধ্যবর্তী একটি বড় শহর জুরজান। তবরিস্থানের অধিবাসীরাও সোভ্যাদের নিকট তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে আর তারাও জিযিয়া দেয়ার শর্তে সন্ধি করে নেয়। সোভ্যাদ পুরো এলাকার লোকদের জন্য শান্তি ও সন্ধিনামা লিখে দেন। কোন ধর্মীয় কথা হয় নি। যারা সন্ধির জন্য হাত বাড়িয়েছে তাদের সাথে শান্তিসন্ধি করা হয়েছে।

এরপর **আযারবাইজানের** বিজয়ও ২২ হিজরীতে হয়েছে। হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে আযারবাইজান অভিযানের পতাকা **উতবাহ্ বিন ফারকাদ** এবং বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্‌কে দেওয়া হয়েছিল আর (এটি) পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা উভয়ে যেন ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করে। বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং **জরমীযান**-এর নিকট রুস্তমের ভাই **আসফান্দ ইয়ার বিন ফাররুখযাদ,** যে **ওয়াজ রূযে**র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল, (সে) মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হয়। আযারবাইজানে এটি বুকায়েরের প্রথম অভিযান ছিল। যুদ্ধ হয়, শত্রু পরাস্ত হয় এবং **আসফান্দ ইয়ার গ্রেফতার হয়। আসফান্দ ইয়ার** ইসলামী সেনাপতি বুকায়েরকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি যুদ্ধ পছন্দ করেন নাকি সন্ধি? বুকায়ের উত্তরে বলেন, সন্ধি। সে (অর্থাৎ **আসফান্দ ইয়ার)** বলে, তাহলে আপনি আমাকে আপনার কাছেই রাখুন, আপনি বন্দি করেছেন (তাই আমাকে) আপনার কাছেই বন্দি রাখুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার সাথে সন্ধি না করবো এরা কখনোই আপোষ করবে না। তারা যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা আশপাশের পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়বে অথবা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আসফান্দ ইয়ারকে বুকায়ের নিজের কাছেই রাখেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য এলাকাও তার হস্তগত হতে থাকে। উতবাহ্ বিন ফারকাদ অপর দিক থেকে আক্রমণ করেন (আর) আসফান্দ ইয়ারের ভাই বাহরাম তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিন্তু যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এই খবর শোনার পর আসফান্দ ইয়ার বলে, এখন যুদ্ধের অগ্নি নিভে গেছে এবং সন্ধির সময় এসে গেছে। অতএব সে সন্ধি করে এবং আযারবাইজানের বাসিন্দারা তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আর এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় যার ভাষা ছিল এরূপ– ‘বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম। আমীরুল মু’মিনীন উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর প্রতিনিধি উতবাহ্ বিন ফারকাদ আযারবাইজানের বাসিন্দাদের এই লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করছে যে, আযারবাইজানের সমতল ভূমি, পাহাড়ি অঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী ও প্রান্তিক জনবসতি এবং সকল ধর্মমতের মানুষকে এ লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করা হচ্ছে। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী জিযিয়া বা কর প্রদানের শর্তে তাদের সবার প্রাণ, ধনসম্পদ, নিজেদের ধর্ম ও শরীয়তের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শিশু, মহিলা, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের, অর্থাৎ যারা চিররোগী এবং যাদের কাছে কোন সম্পদ নেই আর নিভৃতে ধ্যানমগ্নদের বেলায়ও এই কর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু এই (কর) তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা এখানকার বাসিন্দা এবং তাদের জন্যও যারা বাহির থেকে এসে স্থানীয়দের সাথে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। অর্থাৎ

ভবিষ্যতে এখানে এসে যারা বসতি স্থাপন করবে তাদের জন্যও (প্রযোজ্য)। ইসলামী সেনাবাহিনীর এক দিন ও এক রাতের আতিথেয়তা করা এবং তাদেরকে পথ বাতলে দেওয়া তাদের দায়িত্ব হেব। কারো কাছ থেকে কোন সামরিক কাজ নেয়া হলে তার কর মওকুফ করা হবে। যারা এখানে বসবাস করবে তাদের জন্য এসব শর্ত (প্রযোজ্য) আর যারা এখান থেকে বাইরে যেতে চায় তারা তাদের নিরাপদ স্থানে যাওয়া পর্যন্ত নিরাপদ। জুনদুব এই চুক্তিপত্র লিখেছে আর এতে সাক্ষী ছিল বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ এবং সিমাক বিন খারশাহ্।

আরমেনিয়ার (সাথে) শান্তিচুক্তি সম্পর্কে লেখা আছে, আযারবাইজান জয়ের পর বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ আরমেনিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। তার সাহায্যের জন্য সুরাকা বিন মালেক বিন আমরের নেতৃত্বে হযরত উমর (রা.) একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন আর এই অভিযানের সেনাপতিও সুরাকাকেই নিযুক্ত করেন। এছাড়া অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন আব্দুর রহমান বিন রাবিয়াকে। হুযায়ফা বিন আসীদ গিফারীকে এক উইং বা পার্শ্বের অফিসার নিযুক্ত করেন আর নির্দেশ দেন, এই সেনাদল যখন আরমেনিয়াগামী বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্র সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে তখন (সেনাদলের) দ্বিতীয় উইং বা পার্শ্বের নেতৃত্বভার যেন বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্র হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই সেনাদল যাত্রা করে এবং অগ্রবাহিনীর নেতা আব্দুর রহমান বিন রাবিয়া দ্রুতগতিতে পথ চলে বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্র সেনাদলকে পিছনে ফেলে **বাব** নামক স্থানের নিকটে গিয়ে উপনীত হন যেখানে আরমেনিয়ার শাসক শাহরাবরায অবস্থান করছিল। এই ব্যক্তি ইরানী ছিল। সে আবদুর রহমানের কাছে চিঠি লিখে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আদায় করে আর আবদুর রহমানের নিকট উপস্থিত হয়। সে ইরানী ছিল আর আরমেনীয়দের সে ঘৃণা করত। সে আবদুর রহমানকে সন্ধির প্রস্তাব দেয় আর অনুরোধ করে যে, আমার কাছ থেকে যেন জিযিয়া না নেয়া হয়। আমি প্রয়োজনে সামরিক সাহায্য দিব। এখানে অন্য আরেক ধরনের সন্ধি হচ্ছে। নিজেই এসে সন্ধি করে। সোরাকা এ প্রস্তাব মেনে নেন এবং যুদ্ধ ছাড়াই আরমেনিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে যখন এধরনের চুক্তির সংবাদ উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি কেবল এই সন্ধিতেই সম্মতি দেন নি বরং অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন। হযরত সোরাকা লিখিত যে চুক্তি করেন তা হলো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এটি সেই চুক্তিপত্র যা আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাবের গভর্ণর সোরাকা বিন আমর শাহরাবরায এবং আরমেনিয়া ও আরমেনের অধিবাসীদের প্রদান করছে। তিনি প্রাণ, সম্পদ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্ত প্রদান করছেন, তাদের যেন কোন ক্ষতি করা না হয়। কোন আক্রমণ হলে তারা সামরিক দায়িত্ব পালন করবে। শাসক সঙ্গত মনে করলে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করবে। তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হবে না। কিন্তু জিযিয়ার পরিবর্তে সামরিক সেবা নেয়া হবে। কিন্তু যারা সামরিক সেবা প্রদান করবে না তাদের ওপর আজারবাইজানের অধিবাসীদের মতো জিযিয়া আরোপিত হবে, পথ দেখাতে হবে এবং পুরো একদিনের আতিথেয়তা করতে হবে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সামরিক সেবা নিলে জিযিয়া নেয়া হবে না আর সামরিক সেবা না নিলে জিযিয়া নেয়া হবে। এরও সাক্ষী রয়েছে আর তারা হলেন, আবদুর রহমান বিন রাবিয়া, সালমান বিন রাবিয়া এবং বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্। মারজি বিন মুকার্‌রিন এই চুক্তিপত্র লিখেন আর তিনিও এর সাক্ষী ছিলেন।

এরপর সোরাকা আরমেনিয়ার পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে সৈন্য প্রেরণ করতে আরম্ভ করেন। অতএব বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্, হাবীব বিন মাসলামা, হুযায়ফা বিন আসীদ এবং সালমান

বিন রাবিয়ার নেতৃত্বে সৈন্যরা এসব পাহাড়ে যাত্রা করে। বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্‌কে মোকানে প্রেরণ করা হয়। হাবীবকে তাফলিসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় আর হুযায়ফা বিন আসীদকে লান পাহাড়ে বসবাসকারীদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করা হয়। সোরাকার এসব সেনাদলের মাঝে বুকায়ের বিন আব্দুল্লাহ্ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন। তাকে মোকানে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি মোকানবাসীদের নিরাপত্তার চুক্তিপত্র প্রদান করেন। এই চুক্তিপত্রটি হলো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। এটি সেই চুক্তিপত্র যা বুকায়ের বিন আবদুল্লাহ্ কাবাহ্‌র পাহাড়ে মোকানবাসী লোকদের দিয়েছেন। কর প্রদানের শর্তে প্রাণ, সম্পদ, ধর্ম এবং শরীয়তের ক্ষেত্রে তারা নিরাপদ, যা প্রত্যেক সাবালকের ক্ষেত্রে এক দিনার বা এর সমমূল্য। যে স্থানেই চুক্তি হচ্ছে সেখানেই ধর্মীয় স্বাধীনতা তথা শরীয়তের স্বাধীনতা রয়েছে। অথচ ইসলামের ওপর আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে। কাউকেই জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নি। এছাড়া তারা উপকার করবে বা ভালো চাইবে, মুসলমানদের পথ বাতলে দেবে এবং এক দিন ও এক রাত আতিথেয়তা করবে। তারা যতদিন এই চুক্তিনামা মেনে চলবে এবং কল্যাণকামী থাকবে ততদিন তারা নিরাপদ থাকবে। অপর দিকে আমাদের দায়িত্ব তাদের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করা আর আল্লাহ্‌ই সাহায্যকারী। কিন্তু যদি তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করে আর কোন ধরনের প্রতারণা করে তাহলে তারা আর নিরাপত্তা পাবে না। তারা যদি প্রতারকদেরকে সরকারের হাতে তুলে না দেয় তাহলে তারাও তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে। এই চুক্তিপত্রেও চার-পাঁচজন সাক্ষী স্বাক্ষর করেন।

এরপর রয়েছে খুরাসানের বিজয় যা ২২ হিজরী সনে হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ হলো, জালুলার যুদ্ধের পর ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদাযার্দ র‍্যা-এ পৌঁছায়। সেখানকার শাসক আবান জাযবিয়া ইয়াযদাযার্দের ওপর হামলা করে আর ইয়াযদাযার্দের সিল মোহর করায়ত্ব করে নিজের মর্জি মাফিক নথিপত্র তৈরি করার পর তাকে সেই আংটি ফেরত দিয়ে দেয়। এরপর আবান হযরত সা'দ (রা.)-এর কাছে আসলে লিখিত সকল নথিপত্র তাকে দিয়ে দেয়। অর্থাৎ যেসব দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছিল তা তাকে ফেরত দেয়। ইয়াযদাজার্দ র‍্যা থেকে আসফাহান এর দিকে রওয়ানা হয়। ইয়াযদাজার্দ-এর সেখানে অবস্থান করা আবান-এর পছন্দ হয় নি। তাই ইয়াযদাজার্দকে কিরমান-এর দিকে রওয়ানা হতে হয়। পবিত্র আগুন তার সাথে ছিল। তারা যেহেতু অগ্নি উপাসক ছিল তাই আগুন সাথে নিয়ে ঘুরত। তাদের যে পবিত্র আগুন ছিল তা তার সাথে ছিল। এরপর সে খুরাসানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে আর মার্ভ-এ এসে অবস্থান নেয়। পবিত্র অগ্নিকে সেখানে প্রজ্জ্বলিত করে আর এর জন্য অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করায় এবং বাগান লাগায় যা মার্ভ থেকে দুই ফারসাখ অর্থাৎ ছয় মাইল দূরে ছিল। এখানে এসে সে শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করতে থাকে। এখনও বিজিত হয়নি এমন অঞ্চল সমূহের অনারবদের সাথে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ দৃঢ় করে, এমনকি তারা সবাই তার অনুগত এবং আজ্ঞাবহ হয়ে যায়। অধিকন্তু সে বিজিত অঞ্চলগুলোর পারস্যবাসীদের এবং হুরমুযানকেও প্ররোচিত করে। অতএব সেই প্ররোচনার ফলে তারা মুসলমানদের সাথে নিজেদের বিশ্বস্ততার বন্ধন ছিন্ন করে আর বিদ্রোহ করে বসে। সেই সাথে জিবালবাসী এবং ফিরোযানবাসীও তাদের দেখাদেখি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং বিদ্রোহ করে বসে। জিবাল হলো ইরাকে একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চলের নাম, যা আসফাহান থেকে নিয়ে যানজান, কাযভীন, হামাযান, র‍্যা ইত্যাদি শহর নিয়ে গঠিত। ফিরোযান হলো আসফাহান এর একটি জনবসতির নাম।

যাহোক, এসব কারণে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের অগ্রাভিযান করে ইরানে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। অতএব কূফাবাসী এবং বসরাবাসীরা রওয়ানা হয় আর তারা তাদের দেশে পৌঁছে প্রচণ্ড আক্রমণ করা আরম্ভ করে। আহনাফ বিন কায়েস খুরাসান এর দিকে রওয়ানা হন। পথে তিনি মেহেরজান কাযাক দখল করেন। মেহেরজান কাযাক হলো হুলওয়ান থেকে নিয়ে হামাযান পর্যন্ত পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি বিস্তীর্ণ এলাকা, যা বহু শহর এবং বসতি নিয়ে গঠিত ছিল। এরপর আরও অগ্রসর হয়ে আসফাহান এর দিকে রওয়ানা হন। তখন কূফাবাসী জ্যা অবরোধ করে রেখেছিল। জ্যা-ও আসফাহান এর পাশের একটি প্রাচীণ শহরের নাম ছিল, যা আজকাল প্রায় বিরাণ অবস্থায় রয়েছে। অনারবদের মঝে এটি আবশারাস্তান হিসেবে পরিচিত। তিনি তাবাসান এর পথ দিয়ে খুরাসান-এ প্রবেশ করেন এবং তরবারির জোরে হারাত দখল করে নেন। তাবাসান একটি ছোট শহর, যা নিশাপুর ও আসফাহান এর মাঝে অবস্থিত। পারস্যে এটিকে মুফরাদ বা একবচনে তাবাস পড়া হয়। হারাত হলো খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহরগুলোর মাঝে একটি মহান ও প্রসিদ্ধ শহর। তিনি সেখানে সুহার বিন ফালাঁ আবদি-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। এরপর আরো অগ্রসর হয়ে মার্ভ শাহে জাহান এর দিকে রওয়ানা হন। মার্ভ শাহে জাহান খুরাসান এর শহর উপশহরগুলোর মাঝে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এটি নিশাপুর থেকে ২১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সময়ের মাঝে কারো সাথে কোন যুদ্ধ হয় নি। তাই নিশাপুর এর দিকে মুতাররেফ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন শাখীরকে প্রেরণ করেন আর সারখাস এর দিকে হারেস বিন হাসানকে রওয়ানা করেন। সারখাসও খুরাসান এর পাশে একটি পুরোনো ও বড় শহর, যা নিশাপুর ও মার্ভ এর মাঝে অবস্থিত। যাহোক যখন আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহে জাহান-এর নিকটে পৌঁছেন তখন ইয়াযদাজার্দ মার্ভ রূয চলে যায় এবং সেখানে বসবাস করতে থাকে। মার্ভ রূয নামকরণের কারণ হলো মার্ভ সেই সাদা পাথরকে বলা হয় যাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তা কালোও হয় না আর লালও না। আর রূয ফারসী ভাষায় নদীকে বলা হয়। অর্থাৎ অর্থ দাঁড়ায় নদীর মার্ভ। এটি মার্ভ শাহে জাহান থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অনেক বড় একটি নদীর পাশে অবস্থিত। আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহে জাহান-এ অবস্থান গ্রহণ করেন। ইয়াযদাজার্দ মার্ভ রূয-এ পৌঁছে ভয়ে বিভিন্ন শাসকের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। সে খাকান-এর কাছেও সাহায্যের আবেদন করে। সুগদ এর রাজার কাছেও লিখে পাঠায় যেন সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তার সাহায্য করা হয়। সুগদ হলো সেই এলাকা যেখানে সমরকন্দ ও বুখারা ইত্যাদি অবস্থিত। অধিকন্তু সে চীনের বাদশাহর কাছেও সাহায্যের আবেদন করে। আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহে জাহান-এ হারেসা বিন নু'মান বা'লী-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। ইতোমধ্যে কূফার বাহিনীগুলো তাদের চার নেতার নেতৃত্বে আহনাফ বিন কায়েসের কাছে পৌঁছে যায়। যখন সমগ্র বাহিনী মার্ভ শাহে জাহান চলে আসে, তখন আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ শাহে জাহান থেকে মার্ভ রূয-এর দিকে সৈন্যচালনা করেন। যখন ইয়াযদাজার্দ এই সংবাদ পায় তখন সে বালখ্-এর দিকে যাত্রা করে। বালখ্-ও জীহূন নদীর নিকটে অবস্থিত খুরাসানের একটি সুন্দর শহর ছিল। অতএব আহনাফ বিন কায়স মার্ভ রূযে অবস্থান নেন। যখন কূফার বাহিনীগুলো সরাসরি বালখ্ রওয়ানা হয়ে যায়, তখন আহনাফ বিন কায়েসও তাদের পশ্চাতে রওয়ানা হন। অবশেষে বালখ্-এ কূফার (মুসলিম) বাহিনী ও ইয়াযদাজার্দের বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই হয়; ফলাফল এটি দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'লা ইয়াযদাজার্দকে পরাজিত করেন এবং সে ইরানীদের নিয়ে

নদীর দিকে ছোটে ও নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যায়। ততক্ষণে আহনাফ বিন কায়েসও কূফার বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার হাতে বালখ্ বিজিত করেন; এজন্য বালখ্ কূফাবাসীদের বিজয়গাথার অংশ ছিল। এরপর খুরাসানের যেসব অধিবাসী পালিয়ে গিয়েছিল বা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল তারা এবং নিশাপুর থেকে তাখারিস্তান পর্যন্ত সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা সন্ধি করার জন্য আসতে থাকে। তাখারিস্তান অঞ্চলটি অনেকগুলো শহর নিয়ে গঠিত এবং এটি খুরাসানের পাশেই অবস্থিত, এর সবচেয়ে বড় শহর হলো তালেকান। এরপর আহনাফ বিন কায়েস মার্ভ রূয ফিরে যান এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন। অবশ্য তিনি রবী বিন আমেরকে, যিনি আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, তাখারিস্তানে নিজের স্থালাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। আহনাফ বিন কায়েস হযরত উমরকে খুরাসান জয়ের সংবাদ লিখে পাঠান। খুরাসান বিজয়ের সংবাদ শুনে হযরত উমর বলেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে কোন সৈন্যবাহিনী পাঠানোর পক্ষে ছিলাম না; আর আমার আন্তরিক বাসনা ছিল যে, যদি তাদের ও আমাদের মাঝে আগুনের সমুদ্রের মতো প্রতিবন্ধক থাকত। একথা বলা হয় যে, এরা রাজ্য দখল করতে চাইতো, দেশ দখল করে নিতে চাইতো; অথচ হযরত উমরের আন্তরিক বাসনা এটি ছিল যে, আমি সৈন্যদল পাঠাব না। হযরত আলী হযরত উমরের এই কথা শুনে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি একথা কেন বলেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন, এর কারণ হলো, এখানকার অধিবাসীরা তিনবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে এবং চুক্তি ভঙ্গ করবে, আর তৃতীয়বার তাদেরকে পরাস্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। অপর একটি রেওয়ায়েত হলো, হযরত আলী বিন আবি তালিব বলেন, যখন হযরত উমরের কাছে খুরাসান জয়ের সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি বলেন, হায় যদি আমাদের ও তাদের মাঝে আগুনের সমুদ্রের মতো প্রতিবন্ধক থাকত। একথা শুনে হযরত আলী বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এটি তো আনন্দের বিষয়। আপনার কীসের চিন্তা? বিজয় হয়ে গিয়েছে, আর আপনি বলছেন প্রতিবন্ধক থাকলে ভাল হতো! হযরত উমর বলেন, হ্যাঁ, আনন্দের বিষয় তো বটেই, কিন্তু আমি এজন্য চিন্তিত যে, এরা তিনবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। আরেক রওয়ায়েতে রয়েছে যে, যখন হযরত উমর এই সংবাদ পান যে, মার্ভের উভয় শহরেই আহনাফ বিন কায়েসের করায়ত্ব হয়েছে এবং তিনি বালখ্-ও জয় করে নিয়েছেন, তখন তিনি বলেন, আহনাফ বিন কায়েস প্রাচ্যবাসীদের নেতা। এরপর তিনি আহনাফ বিন কায়েসকে চিঠি লিখেন যে, তুমি নদী অতিক্রম করবে না, বরং তুমি এর পূর্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থেকে যেসব বৈশিষ্ট্য অবলম্বনপূর্বক তুমি খুরাসানে প্রবেশ করেছিলে, ভবিষ্যতেও সেসব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখো। এমনটি করলে বিজয় ও সাহায্য সর্বদা তোমার পদচুম্বন করবে। তবে নদী অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইয়াযদাজার্দ প্রথমে নিজের প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, তখন যদিও সেসব সাম্রাজ্য বিশেষ কোন সাহায্য করে নি, কিন্তু এখন ইয়াযদাজার্দ স্বয়ং নিজের দেশ ছেড়ে পালিয়ে তাদের কাছে গিয়ে সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং সেই সাম্রাজ্যগুলোর সাহায্য নিয়ে পুনরায় নিজের দেশ জয় করার সংকল্প করে। তুর্কি সরদার খাকান তাকে সাহায্য করে এবং নিজের বাহিনী নিয়ে বালখ্-এ উপস্থিত হয়। বালখ্ জীহূন নদীর নিকটে খুরাসানের খুব সুন্দর একটি শহর ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। আহনাফ তুর্কি অশ্বারোহী বাহিনীর তিনজনকে হত্যা করেন, যেটিকে তুর্কি-রাজ খাকান অশুভ লক্ষণ মনে করে ফিরে যায়। চীনের সম্রাট মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বৃত্তান্ত ও বর্ণনা শুনার পর সম্রাট ইয়াযদাজার্দকে লিখে যে,

তোমার দূত মুসলমানদের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে তাতে আমার মনে হয়, তারা যদি পাহাড়ের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তবে সেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। আমি তোমার সাহায্যের জন্য আসলেও যতদিন তারা সেসব বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যা তোমার দূত আমাকে জানিয়েছে, অর্থাৎ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে দূত যে কথা বলছে, তাহলে তারা আমার গদিও ছিনিয়ে নিবে; আর আমি তাদের একটি চুলও বাঁকা করতে পারব না। কাজেই তুমি তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নাও। ইয়াযদাজার্দ পুনরায় বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে নিহত হয়।

আহনাফ বিন কায়েস বিজয়ের সংবাদ ও মালে গণিমত হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। হযরত উমর মুসলমানদের সমবেত করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশক্রমে বিজয় সংক্রান্ত লিখিত পত্র পাঠ করে শোনানো হয়। অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁর ভাষণে বলেন, নিশ্চই আল্লাহ্ তাবারাকা ও তা'লা তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই হেদায়েতের কথা উল্লেখ করেছেন; যা সহ মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের সাথে সন্নিকটবর্তী প্রতিদান আর ইহ ও পরজগতে চূড়ান্ত পর্যায়ে হস্তগত হওয়ার মতো কল্যাণ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতঃপর হযরত উমর (রা.) কুরআন করীমের এই আয়াতটি পাঠ করেন–

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থাৎ তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরেকগণ তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (সূরা সাফ্ফ ঃ ১০) অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং নিজ বাহিনীর সাহায্য করেছেন। শোন! আল্লাহ্ তা'লা অগ্নিপূজারী সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছেন এবং তাদের ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছেন; নিজ সাম্রাজ্যের এক বিঘত জমিও এখন আর তাদের মালিকানায় অবশিষ্ট নেই যা দ্বারা তারা কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করতে পারে। শোন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে তাদের ভূমি, তাদের ঘরবাড়ি, তাদের সহায়-সম্পদ এবং তাদের সন্তানসন্ততির উত্তরাধিকারী করেছেন, যেন তিনি দেখেন যে, তোমরা কীরূপ আমল কর। এই কথাটি খুব ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, তোমাদের মতো বহু জাতি-গোষ্ঠী সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল। হযরত উমর (রা.) মুসলমানদেরকে এখানে উপদেশ প্রদান করছেন যে, এই কথাটি খুব ভালোভাবে মাথায় গেঁথে নাও যে, তোমাদের মতো বহু জাতি-গোষ্ঠী সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল এবং অতীতের বহু সভ্য জাতি দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশ দখল করেছিল। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নকারী আর আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং একটি জাতির অবসানের পর অন্য একটি জাতির বিকাশ ঘটাবেন। তোমরা সবাই তাঁর নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য এমন ব্যক্তির আনুগত্য কর যে তোমাদের জন্য তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে আর তোমাদের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখাবে। তোমরা নিজেদের অবস্থায় কখনো কোন পরিবর্তন এনো না, অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের স্থানে অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন। যদি নিজেদের পরিবর্তন কর, নিজ ধর্ম ভুলে যাও, আদেশ অনুযায়ী কাজ না কর তবে আল্লাহ্ তা'লা অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমি এখন উম্মতে মুসলেমার ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি তোমাদেরই হাতে হওয়ার আশঙ্কা করি। শত্রুপক্ষ মুসলমানদেরকে ধ্বংস করবে– আমার এই ভয় নেই, বরং

আমার আশঙ্কা হলো– মুসলিম উম্মাহ্‌র ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি তোমরা মুসলমানরাই করবে। আজ আমরা লক্ষ্য করছি যে, এ কথাটিই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। মুসলমানরাই মুসলমানদের শিরোচ্ছেদ করছে, নিশ্চিহ্ন করছে; একে অপরের ওপর আক্রমণ করছে, এক দেশ অন্য দেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে আর এটিকে জিহাদ নাম দেয়া হয়! অথচ মুসলমান-ই মুসলমানকে হত্যা করছে।

ইস্তাখার বিজয়। ইস্তাখার ছিল পারস্যের কেন্দ্রীয় শহর। এটি সাসানী (পারসিক) রাজাদের প্রাচীণ কেন্দ্রীয় ও পবিত্র স্থান ছিল; এখানে তাদের প্রাচীণ অগ্নিকুণ্ডও ছিল যার দেখাশুনা করতেন স্বয়ং ইরানের বাদশাহ্। হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) ইসতাখারের উদ্দেশ্যে অগ্রযাত্রা করেন এবং ইসতাখারবাসী'র সাথে জওর নামক স্থানে সংঘর্ষ হয়। মুসলমানরা তাদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা জওরবাসীদের মোকাবিলায় মুসলমানদের বিজয় দান করেন, মুসলমানরা ইসতাখার জয় করে। অনেককে হত্যা করা হয় এবং বহু লোক পালিয়ে যায়। হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) কাফেরদের জিযিয়া প্রদানের এবং জিম্মি* প্রজা হওয়ার আহ্বান জানান। তারা তাঁর (সা.) সাথে পত্র বিনিময় করে আর হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) তাদের সাথে পত্র ও বার্তা বিনিময় করতে থাকেন। অবশেষে তাদের বাদশাহ্ হরমুয উক্ত প্রস্তাব মেনে নেয় এবং জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। মোটকথা যারা ইসতাখার বিজয়ের সময় পলায়ন করেছিল বা দলছুট হয়েছিল তারা সকলে জিযিয়া প্রদানের শর্তে পুনরায় শান্তির আবাসে ফিরে আসে। শত্রু পরাস্ত হওয়ার পর হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) গণিমতের সমস্ত সম্পদ একত্রিত করেন এবং তা থেকে খুমুস (তথা এক পঞ্চমাংশ) পৃথক করে আমীরুল মু'মনীন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন আর অবশিষ্টাংশ মুসলমানদের মাঝে বণ্টনের উদ্দেশ্যে রেখে দেন, এছাড়া সকল মুসলিম সৈন্যকে লুটতরাজ থেকে বিরত রাখেন এবং লুণ্ঠিত জিনিস ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ যা কিছু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, সেনাপতি লুণ্ঠিত সব কিছু ফেরত দেয়ার আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) সবাইকে একত্রিত করেন এবং বলেন, যতক্ষণ আমরা চুরি এবং বিশ্বাসঘাতকতা হতে বিরত থাকব ততক্ষণ আমাদের বিষয়টি সর্বশিখরে থাকবে এবং আমরা সকল সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকব। আমরা যখন গণিমতের সম্পদে অসৎ পন্থা অবলম্বন করব, তখন আমাদের মাঝে এই অপছন্দনীয় বিষয়াদি দৃষ্টিগোচর হবে। এই মন্দকর্ম আমাদের অধিকাংশকে নিয়ে ডুববে। যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, যদি চুরি কর তাহলে এটি তোমাদেরকে নিয়ে ডুববে আর বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে আমরা এসব বিষয়ই দেখতে পাচ্ছি। তারা পরস্পর লুটতরাজে লিপ্ত অথবা তারা যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই লুটতরাজ করছে, বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এটিই, বরং এসব অপকর্মই তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে অকর্মণ্য বানিয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র (তাদের কারণে ইসলামের) দুর্নাম হচ্ছে। হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) বিজয়ের দিন বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন শপথের মাধ্যমে কোন কল্যাণ সাধনের ইচ্ছে করেন তখন তাদেরকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের মাঝে আমানত ও সততার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেন। তাই তোমরা আমানতের সুরক্ষা কর, অন্যথায় দ্বীন ও ধর্মের মাঝে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি তোমাদের মধ্য হতে হারিয়ে যাবে তা হলো, 'আমানত'। আর তোমাদের মাঝ থেকে সততা বিলুপ্ত হলে প্রত্যহ তোমাদের মাঝ থেকে কোন না কোন পুণ্য বিলুপ্ত হতে থাকবে। সততা না থাকলে সব পুণ্যও উঠে

যেতে থাকবে। হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালের শেষের দিকে এবং হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম বছর শাহরেক বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সে পারস্যবাসীদের প্ররোচিত করে আর তাদেরকে উত্তেজিত করার ফলে পারস্যবাসীরা চুক্তিভঙ্গ করে। তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.)-কে পুনরায় প্রেরণ করা হয় আর সহায়তার উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন মুআম্মার এবং শুবল বিন মা'বাদ বাজাল্লীর সাথে সহায়ক সেনাদল প্রেরণ করা হয়। সেখানে শত্রুর সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যাতে শারেক এবং তার পুত্র নিহত হয়, এছাড়াও বহু লোককে হত্যা করা হয় আর শারেক'কে হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.)-এর ভাই হাকাম বিন আবুল আস হত্যা করেন।
এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলা বিন হাযরামী সতের হিজরীতে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রথমবার ইস্তাখার জয় করেন। ইস্তাখারবাসীরা সন্ধিচুক্তির পর চুক্তিভঙ্গ করে যার ফলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরকে দমন করার জন্য হযরত উসমান বিন আবুল-আস (রা.) নিজ পুত্র ও সহোদরকে প্রেরণ করেন যারা বিদ্রোহ দমন করেন এবং ইস্তাখারের আমীরকে হত্যা করেন যার নাম ছিল 'শারেক'।

ফাসা এবং দারাবাজির্দ। হযরত সারিয়া বিন যুনায়েম (রা.)-কে হযরত উমর (রা.) ফাসা এবং দারাবাজির্দ শহরে প্রেরণ করেন। এটি ২৩ হিজরী সনের ঘটনা। ফাসা পারস্যের একটি প্রাচীণ শহর ছিল যা শিরায থেকে ২১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। আর দারাবাজির্দ পারস্যের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম যাতে ফাসা ও অন্যান্য শহর অবস্থিত। দালায়েলুন নবুওয়্যত পুস্তকে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সারিয়া (রা.)-এর নেতৃত্বে হযরত উমর (রা.) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। একদিন হযরত উমর (রা.) যখন বক্তৃতা প্রদান করছিলেন হঠাৎ উচ্চস্বরে তিনি বলেন, ইয়া সারিয়া আল-জাবালা। অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও। তাবরির ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, হযরত উমর (রা.) হযরত সারিয়া বিন যুনায়েম (রা.)-কে ফাসা এবং দারাবাজির্দ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই লোকদের ঘিরে ফেলেন। তখন তারা সাহায্যকারীদের ডাক দেয় আর তারা মুসলমান বাহিনীর মোকাবিলার জন্য মরুভূমিতে একত্রিত হয়। তাদের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন তারা মুসলমানদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। হযরত উমর (রা.) জুমুআর দিন খুতবা প্রদান করছিলেন। তিনি হঠাৎ বলেন, ইয়া সারিয়া বিন যুনায়েম! আল-জাবাল, আল-জাবাল। অর্থাৎ হে সারিয়া বিন যুনায়েম! পাহাড়, পাহাড়। মুসলমান সৈন্যবাহিনী যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল তার পাশেই একটি পাহাড় ছিল। পাহাড়ে আশ্রয় নিলে শত্রুরা কেবল একদিক থেকে আক্রমণ করতে পারত। ফলে মুসলমানরা পাহাড়ের পাশে গিয়ে অবস্থান নেয়। আর সেখানে তারা যুদ্ধ করে শত্রুদের পরাজিত করে এবং অনেক গনিমতের সম্পদ তাদের হস্তগত হয়। সেই গনিমতের মালের মধ্যে মণিমুক্তার একটি ছোট সিন্দুক ছিল যেটি সকলের সম্মতিক্রমে মুসলিম বাহিনী হযরত উমর (রা.)-কে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করে। হযরত সারিয়া (রা.) এই সিন্দুকের সাথে বিজয় সংবাদসহ একজন দূত হযরত উমরের কাছে প্রেরণ করেন। সেই দূত যখন মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত উমর (রা.) লোকেদের খাবার খাওয়াচ্ছিলেন। তাঁর হাতে সেই লাঠি ছিল যা দিয়ে তিনি উঁট হাঁকাতেন। সেই দূত যখন হযরত উমর (রা.)-এর সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন তিনি তাকে খাবার খেতে বসিয়ে দেন। সে খাবার খেতে বসে যায়। খাবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর, হযরত উমর (রা.) চলে যাচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি তাঁর পিছু পিছু আসে। হযরত উমর (রা.)

তাকে পিছে পিছে আসতে দেখে ভাবেন, তার হয়ত পেট ভরে নি। তিনি (রা.) ঘরের দরজার নিকট পৌঁছে তাকে বলেন, ভেতরে এসো। অতঃপর নানবাইকে বলেন, টেবিলে খাবার আনো। তারপর খাবার আনা হয় যা রুটি, জলপাই এবং লবণ সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এরপর তিনি (রা.) বলেন, খাও। সে খাবার শেষ করে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি সারিয়া বিন যুনায়েম-এর দূত। তিনি (রা.) বলেন, সুস্বাগতম। তারপর সেই ব্যক্তি তাঁর নিকটে আসে আর এতটাই কাছে এসে যায় যে, তার হাঁটু হযরত ওমরের হাঁটু স্পর্শ করতে থাকে। অতঃপর হযরত উমর (রা.) তার কাছে মুসলমানদের খবরাখবর জানতে চান, এরপর সারিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেন। সে তাঁকে সব অবহিত করে। এরপর সে সিন্দুকের বৃত্তান্ত শুনায়। হযরত উমর (রা.) তার দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে বলেন, না। এতে সম্মানের কিছু নেই। বরং তুমি এটি সেই সৈন্যবাহিনীর নিকট নিয়ে যাও এবং তাদের মাঝে তা বণ্টন করে দাও। এই মণিমুক্তা যা আমাকে পাঠিয়েছে, তা সেনাবাহিনীর মাঝে বণ্টন করে দাও। সেই ব্যক্তি নিবেদন করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার উঁট দুর্বল হয়ে গেছে আর আমি পুরস্কারের আশায় কিছু ঋণও করেছিলাম। তাই দয়া করে আপনি আমাকে ততটা দিন যার সুবাদে আমি ঋণ পরিশোধ করতে পারব। সেই ব্যক্তির বারবার আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) তার উঁটের বদলে যাকাতের উঁট থেকে তাকে একটি উঁট প্রদান করেন এবং তার উঁটটি বাইতুল মালের উঁটের সাথে রেখে দেন। সেই দূত হতাশ ও নিরাশ হয়ে বসরায় পৌঁছায় এবং হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশ পালন করে।

এটিও বর্ণনা করা হয়ে থাকে, দূত যখন বিজয় সংবাদ নিয়ে মদীনায় পৌঁছে তখন মদীনাবাসি তার কাছে সারিয়ার বিষয়ে এবং বিজয় সম্পর্কে জানতে চায়। তারা এটিও জানতে চায় যে, যুদ্ধের দিন মুসলমানরা কি কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিল? সে বলল, হ্যাঁ, আমরা ইয়া সারিয়াতাল জাবাল ধ্বনি শনেছিলাম। অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে যাও। আমরা সেই মুহূর্তে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম। অতঃপর আমরা পাহাড়ের দিকে যাই এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিজয় দান করেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) সংক্রান্ত একটি ঘটনা লিখিত আছে। তিনি তার খিলাফতকালে মিম্বরে চড়ে খুতবা প্রদান করছিলেন। ঠিক তখন অবলীলায় তার মুখ থেকে এই শব্দ নিঃসৃত হয়, ইয়া সারিয়াতু! আল-জাবাল, ইয়া সারিয়াতু! আল-জাবাল। অর্থাৎ, হে সারিয়া! পাহাড়ে আরোহন কর, পাহাড়ে আরোহন কর। যেহেতু এই বাক্যগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিচ্ছন্ন ছিল তাই মানুষ তাকে প্রশ্ন করে যে, আপনি এটি কি বলেছিলেন? তখন তিনি বলেন, আমাকে দেখানো হয়েছে, এক স্থানে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর জেনারেল সারিয়া দণ্ডায়মান ছিল এবং শত্রু তাদের পেছন থেকে এরূপভাবে আক্রমণে উদ্যত যে, ইসলামী সৈন্যবাহিনী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিল। তখন আমি দেখলাম নিকটেই একটি পাহাড় আছে যেটিতে আরোহন করে তারা শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে। তাই আমি তাদেরকে উচ্চস্বরে সেই পাহাড়ে আরোহন করতে বললাম। অল্প কয়েকদিন যেতেই সারিয়ার পক্ষ থেকে হুবহু এমন খবরই আসে আর তিনি এটিও লিখেন যে, সেই সময় একটি শব্দ আসে যা হযরত উমর (রা.) এর কণ্ঠস্বরের ন্যায় ছিল, যা আমাদেরকে বিপদ সম্পর্কে অবগত করে এবং আমরা পাহাড়ে আরোহন করে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনা থেকে

বুঝা যায়, হযরত উমর (রা.)-এর ভাষা সেই সময় তার নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং সেই সর্বশক্তিমান সত্তার অধীনে ছিল যার জন্য দূরত্ব ও ব্যবধান কোন বিষয় নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এ সম্পর্কে বলেন, আমরা এটিও বলি যে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এমন এলহাম প্রমাণিত নয় মর্মে আপত্তিটি একেবারে বৃথা ও ভ্রান্ত। কেননা সহীহ হাদীস অনুসারে সাহাবায়ে কেরামের ইলহাম ও অলৌকিক ঘটনার অগণিত প্রমাণ রয়েছে। হযরত উমর (রা.)-এর সারিয়ার সৈন্যবাহিনীর বিপজ্জনক অবস্থা ঐশী ইঙ্গিতে অবগত হওয়ার ঘটনা, যা বায়হাকী ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন এলহাম ছাড়া আর কী হতে পারে? এরপর! মদিনায় বসা অবস্থায় তার মুখ থেকে ইয়া সারিয়া! আল-জাবাল, আল-জাবাল শব্দ নিঃসৃত হওয়া এবং সেই আওয়াজ অদৃশ্য শক্তির কল্যাণে সারিয়া ও তার সৈন্যবাহিনীর দূরবর্তী এলাকা থেকেও শ্রবণ করা অলৌকিক নিদর্শন নয় তো কি?

এরপর কিরমান বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে যা ২৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। হযরত সুহায়েল বিন আদী-র হাতে কিরমানের বিজয় অর্জিত হয়েছে। এটিও বলা হয় যে, আব্দুল্লাহ্ বিন বুদাইলের হাতে এই বিজয় অর্জিত হয়েছে। হযরত সুহায়েল-এর বাহিনীর অগ্রসারিতে নুসাঈর বিন আমর বাজলী ছিলেন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কিরমানবাসীরা সমবেত হয়। তারা নিজেদের আবাসভূমির পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ করছিল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করেন এবং মুসলমানরা তাদের পথ অবরুদ্ধ করে। নুসাঈর তাদের বড় বড় সর্দারদের হত্যা করেন। অনুরূপভাবে হযরত সুহায়েল বিন আদী গ্রাম্য বাহিনীর মাধ্যমে জিরাফ পর্যন্ত শত্রুদের পথ আটকে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ও শিরের পথ ধরে সেখানে পৌঁছেন এবং আশানুরূপভাবে সেই স্থানে বহু সংখ্যক উট, ভেড়া ও বকরী পান। তখন তারা উট, ভেড়া এবং বকরীর মূল্য নির্ধারণ করেন। মূল্য আরবের উটের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে তাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হযরত উমর (রা.) কে এ সম্পর্কে লিখা হয়। হযরত উমর (রা.) তাকে লিখে পাঠান যে, মাংস অনুযায়ী আরব উটের মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং এসব উটও সেগুলোর মতোই। যদি সেগুলোর মূল্য তোমাদের ধারণানুযায়ী বেশি হয় তাহলে মূল্য বাড়িয়ে দাও। যে সম্পদ হস্তগত হয়েছে সে অনুযায়ী প্রাণীগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বুদায়েল বিন ওরাকা খুযাই কিরমান জয় করেছিলেন। কিরমান জয়ের পর তিনি তাবসাইনে আসেন। এরপর তিনি সেখান থেকে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমি তাবসাইন জয় করে ফেলেছি, আপনি আমাকে উক্ত দুই অঞ্চল জায়গীরস্বরূপ দিয়ে দিন। হযরত উমর (রা.) যখন তাকে উক্ত দুই অঞ্চল জায়গীরস্বরূপ দিতে মনস্থ করেন তখন কেউ একজন তাঁকে বলে, এ উভয় অঞ্চল আয়তনে অনেক বড় জিলা আর খুরাসানের প্রবেশদ্বার। একথা শুনে তিনি তাকে উক্ত দুই অঞ্চল পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করার পরিকল্পনা স্থগিত করেন।

সিজিস্তান বিজয়; এটিও ২৩ হিজরী সনে বিজিত হয়েছে। সিজিস্তান খুরাসান থেকেও আয়তনে বড় আর এর সীমান্ত দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু এবং বালখ নদীর মাঝে এই এলাকা অবস্থিত। এর সীমান্তসমূহ খুবই দুর্গম ছিল এবং জনবসতিও অনেক ছিল। সিজিস্তানকে ইরানী সীস্তানও বলে বা ইরানীরা এই সিজিস্তানকে সীস্তান বলে। ইরানের প্রখ্যাত পালোয়ান রুস্তম এ এলাকারই অধিবাসী ছিল। এটি কিরমানের উত্তরে অবস্থিত, এর রাজধানী ছিল যারাঞ্জ। প্রাচীন যুগে এটি অনেক বড় অঞ্চল ছিল আর হযরত মুআবিয়ার যুগে

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল। এ অঞ্চলের লোকেরা সচারচর কান্দাহার, তুর্কী এবং অন্যান্য জাতির সাথে যুদ্ধ করতো। হযরত আসেম বিন আমর সিজিস্তান অভিমুখে রওয়ানা হন আর আব্দুল্লাহ্ বিন উমায়েরও সৈন্যসামন্ত নিয়ে তার সাথে গিয়ে মিলিত হন। সিজিস্তানীদের সাথে নিকটবর্তী এলাকায় যুদ্ধ হয় এবং মুসলমানরা তাদেরকে পরাস্ত করে। সিজিস্তানীরা পালিয়ে যায়, মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং যারাঞ্জ নামক স্থানে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। একই সাথে যেখানে সম্ভব হয়েছে মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে থাকে। অবশেষে সিজিস্তানীরা যারাঞ্জ এবং অন্যান্য বিজিত অঞ্চলের বিষয়ে সন্ধি করে নেয় আর রীতিমতো মুসলমানদের কাছ থেকে চুক্তি অনুমোদন করায়। তারা তাদের চুক্তিপত্রে এই শর্তও অনুমোদন করিয়ে নেয় যে, তাদের জঙ্গল সংরক্ষিত চারণভূমির ন্যায় বিবেচ্য হবে। এজন্য মুসলমানরা যখনই সেপথ দিয়ে অতিক্রম করতো এই জঙ্গল এড়িয়ে চলত পাছে আবার তারা সেগুলোর ক্ষতিসাধন করে চুক্তিভঙ্গ না করে বসে। মুসলমানরা এমন সতর্কতা অবলম্বন করত। যাহোক সিজিস্তানীরা কর দিতে সম্মত হয়ে যায় আর মুসলমানরা তাদের নিরাপত্তার দায়ভার গ্রহণ করে নেয়।

মুকরান বিজয়, এটিও ২৩ হিজরী সনে হয়েছে। মুকরান যাকে বর্তমানে মাকরান বলা হয় এটি প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থে মুকরান হিসেবেই উল্লিখিত আছে। হাকাম বিন আমরের হাতে মুকরান জয় হয় আর শিহাব বিন মুখারেক, সুহায়েল বিন আদী, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উতবান– নিজেদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে তার সাথে মিলিত হন।

মুসলমানরা সিন্ধুর রাজার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করে। হাকাম বিন আমর সাহার আবদীর হাতে বিজয়ের সুসংবাদ এবং গণিমতের মাল প্রেরণ করেন এবং গণিমতের সম্পদ হিসাবে প্রাপ্ত হাতিগুলো সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা চেয়ে পাঠান। হযরত উমর (রা.) বিজয়ের সুসংবাদ লাভ করার পর তিনি তাকে মুকরানের ভূমি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে অঞ্চলের নরম ভূমিও পাহাড়ের মতো শক্ত আর সেখানে পানির চরম সংকট রয়েছে। এর ফলফলাদি ভালো না আর সেখানকার শত্রুরা খুবই দুঃসাহসী আর সেখানে ভালোর তুলনায় মন্দই বেশি। সেখানে সংখ্যার আধিক্যও সংখ্যার স্বল্পতা মনে হয় আর সংখ্যায় যা স্বল্প তা বিলুপ্ত হয়ে যায় আর এর অন্তরালের অবস্থা তো আরো করুণ। হযরত উমর (রা.) তার এমন বাচনভঙ্গি দেখে বলেন, তুমি কি ছন্দের যাদুকরি করছ নাকি সত্যিকার অবস্থার বিবরণ দিচ্ছ। সে উত্তরে বলে, আমি সঠিক সংবাদই আপনার কাছে উপস্থাপন করছি। এতে তিনি (রা.) বলেন, যদি তুমি সঠিক কথা বলে থাক তবে খোদার কসম! আমার সৈন্যবাহিনী সেখানে আক্রমণ করবে না। অতঃপর তিনি (রা.) হাকাম বিন আমর ও হযরত সুহায়েল-কে এই নির্দেশনামা লিখে পাঠান যে, তোমাদের উভয়ের সৈন্যবাহিনীর কেউ-ই যেন 'মাকরান' থেকে সামনে অগ্রসর না হয় এবং নদীর এপারেই যেন অবস্থান করে। অধিকন্তু তিনি (রা.) এই নির্দেশও প্রদান করেন যে, হাতিগুলোকে মুসলিম এলাকাতেই বিক্রি করে এর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেন বণ্টন করে দেয়া হয়। এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা তাবারী থেকে নেয়া হয়েছে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লামা শিবলী একটি নোটও লিখেছেন যে, 'ফুতুহাতে ফারুকী' তথা হযরত উমর (রা.)-এর যুগের বিজয়সমূহের শেষ সীমা হলো এই 'মাকরান'। কিন্তু এটি তাবারীর বর্ণনা। ইতিহাসবিদ বালাযুরি বর্ণনা করেন যে, দীবালের নিম্নাঞ্চল এবং থানা পর্যন্ত সৈন্যবাহিনী পৌঁছে। এই বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকলে হযরত উমর (রা.)-এর যুগেই

ইসলাম সিন্ধু ও ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। এ ছাড়া তিনি টীকায় লিখেন যে, বর্তমানে মাকরানের অর্ধেক অংশ বেলুচিস্তান নামে পরিচিত। যদিও ইতিহাসবিদ বালাযুরি হযরত ওমরের বিজয়ের শেষ সীমা সিন্ধুর শহর দিবাল পর্যন্ত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাবারী মাকরানকেই শেষ সীমা আখ্যায়িত করেছেন। যাহোক হযরত উমর (রা.)-এর যুগের স্মৃতিচারণ চলমান থাকবে।

জুমু'আর নামাযের পর আমি একটি তুর্কী ইন্টারনেট রেডিও চ্যানেলের শুভ উদ্বোধন করব। এই রেডিও চ্যানেলের নাম হলো, 'ইসলাম আহমদীয়্যাতীন সিসি' অর্থাৎ ইসলামে আহমদীয়াতের বাণী, যা এখন ২৪ ঘন্টা সম্প্রচারের জন্য প্রস্তুত, আলহামদুলিল্লাহ্। এই রেডিও চ্যানেলটি সারাবিশ্বে ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি লিংকের মাধ্যমে শোনা যাবে। চার ঘন্টা সম্বলিত একটি প্যাকেজ অনুষ্ঠান দিনে ৬ বার পুনঃপ্রচারিত হবে। এই প্যাকেজে এক ঘন্টা তুর্কী অনুবাদসহ কুরআন তিলাওয়াত, হাদীসে নববী (সা.), কালামুল ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), তুর্কী ভাষায় অনুবাদকৃত আমার খুৎবাসমূহ, এমনকি একটি প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানও প্রচারিত হবে। পৃথিবীর ২০টিরও অধিক দেশ তবলীগী ও তরবিয়্যতী ক্ষেত্রে এই রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমে উপকৃত হবে, ইনশাআল্লাহ্। উদাহরণস্বরূপ আযারবাইজান, জর্জিয়া-এগুলো তুর্কী ভাষাভাষী দেশ। কতক রাশিয়ান অঙ্গরাজ্য রয়েছে যেখানে তুর্কী ভাষা বলা হয়। অনুরূপভাবে তুরস্ক এবং সে সকল ইউরোপিয়ান দেশসমূহ যেখানে তুর্কী জনবসতি রয়েছে, এই সম্প্রচারের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে। এই রেডিও চ্যানেল প্রস্তুতের সৌভাগ্য জার্মানীর তবলীগ বিভাগ লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও পুরস্কৃত করুন এবং এটিকে সর্বদিক হতে কল্যাণমণ্ডিত করুন। এটি এখন আমি জুমু'আর নামাযের পর উদ্বোধন করব।

কতক গায়েবানা জানাযা রয়েছে। সেগুলো জুমু'আর নামাযের পর আদায় করব। একইসাথে এটিও বলে দিচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় ও স্নেহের তালে-এর মরদেহ এখনো পৌঁছায় নি। সম্ভবত কয়েকদিন লেগে যাবে। তাই যখন আসবে তখন জানাযার নামায আদায় করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ এবং তখন তার স্মৃতিচারণও করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যাদের গায়েবানা জানাযা আজ আমি পড়ব তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন মোকার্‌রম মুহাম্মদ আল্ মুখতার কাবকা সাহেব, যিনি মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৭৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম ২০০৯ সনে বয়'আত করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহ্‌মদী ছিলেন। বয়'আতের পর জামা'তের সেবায় এবং আহমদীয়াতের তবলীগী কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত-বিশ্বাস দূরীকরণে তিনি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পশ্চিম মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। সেখানকার সদর সাহেব লিখেন, মরহুম অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ছিলেন, শিক্ষিত ছিলেন, আরবী ছাড়াও ফরাসী এবং স্পেনিশ ভাষায় দক্ষতা রাখতেন । 'হামামাতুল বুশরা' পুস্তকটি পড়ার পর তৎক্ষণাৎ বয়আত করেন। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অত্যন্ত আগ্রহভরে এবং ভালোবাসার সাথে কমপক্ষে দুইবার পড়েছেন। তফসীরে কবীর পড়েন। সেটির কপি করে ও বাধাই করিয়ে আহমদীদের মাঝে বিতরণ করেন। তিনি বলেন, যখন আমাদের অঞ্চলে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তিনি জামা'তী খেদমতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং বিভিন্ন জামা'তে সফর করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্রগামী ছিলেন। কখনো তিনি একথা বলেননি যে, আজ আমি ব্যস্ত অথবা খেদমত করতে পারব না।

এতটা দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যা যুবকদের মাঝেও লক্ষ্য করা যায় না। ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক আনুগত্য করতেন। তবলীগ করার প্রচণ্ড আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল। গাড়ি, বাস, ট্রেন, দোকানপাটে ছোট বড় সবাইকে তবলীগ করতেন। নিজ বংশের প্রতিটি মানুষকে সত্যের বাণী পৌঁছিয়েছেন। মরহুম নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আমার পক্ষ থেকে যে দোয়াগুলো করতে বলা হয়েছিল তা সবসময় পড়তেন এবং জুবিলীর দোয়াও নিয়মিত পড়তেন। দৈনিক পাঁচ থেকে দশ রুকু কুরআন করীম তিলাওয়াত করতেন। চলাফেরার সময় তিনি কুরআন করীম মুখস্ত করতেন, রিভিশন করতেন। আর কখনো কখনো রাস্তায় হাঁটার সময় কুরআন তিলাওয়াতে এতটাই মগ্ন হয়ে যেতেন যে, চারপাশে কী হচ্ছে জানতেই পারতেন না। যেন কুরআন করীমের সাথে তার এক গভীর ভালোবাসা ছিল। বরং অনেকে বলেন, রাতে ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার মুখ থেকে কুরআন করীমের আয়াত পড়ার আওয়াজ শোনা যেত। মরহুম পশ্চিম মরক্কোতে নয় বছর জামা'তের নায়েব সদর, আনসারুল্লাহ্‌র সদর এবং সেক্রেটারী মালের দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার স্ত্রীও একজন নিষ্ঠাবতী আহমদী আর তিনিও ওসীয়্যত করেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ কাদিয়ানের মসজিদে আকসা এবং মসজিদে মুবারকের সাবেক খাদেম মাহমুদ আহমদ সাহেবের যিনি কিছুদিন পূর্বে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম বালগামের মাখদুম হোসাইন সাহেবের পুত্র ছিলেন, যিনি কর্ণাটক প্রদেশ থেকে কাদিয়ানে হিজরত করেছিলেন। তিনি ২৮ বছর পর্যন্ত মসজিদে আকসা এবং মসজিদে মুবারকে খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। মরহুম একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। নামাজ, রোযা, তাহাজ্জুদ এবং দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। মসজিদের প্রতি তার বিশেষ টান ও ভালোবাসা ছিল। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র এবং এক মেয়ে রেখে গেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে ভারতের কেরালা নিবাসী আব্দুর রহমান সাহেবের স্ত্রী সওদা সাহেবার যিনি গত ২২ জুলাই তারিখে ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মুরহুমা কাবাবীরের মুবাল্লেগ ইনচার্জ শামসুদ্দীন সাহেব মালাবারীর মাতা ছিলেন। শামসুদ্দীন সাহেব বলেন, আমার মা মরহুম বিটি মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন যিনি পালকাঠ জেলার সর্বপ্রথম আহমদী ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বয়া'ত গ্রহণ করেন। এরপর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রচণ্ড অত্যাচারের সম্মুখীন হন। এই বয়কটের সময়েই যখন আমার মা দেড় বছর বয়স্কা ছিলেন আমার নানী এবং তার বড় মেয়ে মারা যায়। মৃত্যুর পর বিরুদ্ধবাদীরা নানীকে দাফনও করতে দেয় নি যার কারণে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে শহরের সাধারণ কবরস্থানে তাকে দাফন করতে হয়েছিল। নানা তার অল্পবয়সী ছোট মেয়েকে নিয়ে হিজরত করেন। এভাবে আমার মা ছোটকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হন। মরহুমা নামায এবং রোযায় অভ্যস্ত ও ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তার মাঝে সৃষ্টির প্রতি গভীর সহানুভূতির প্রেরণা ছিল। প্রত্যেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা আর যদি সে উপস্থিত থাকে তাকে সাহায্য করা তার অভ্যাস ছিল। রেখে যাওয়া পরিবারে স্বামী ছাড়াও চার পুত্র এবং দুই মেয়ে রয়েছে। তার একজন পৌত্র একজন ওয়াকফে জিন্দেগী। তার একজন ছেলে মুবাল্লেগ যিনি বাহিরে ছিলেন, যার কারণে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ ফয়সালাবাদ নিবাসী শেখ আব্দুল মাজিদ সাহেবের সহধর্মিণী সৈয়দা মাজিদ সাহেবার। কিছুদিন পূর্বে তিনি ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পুত্র শেখ ওয়াহিদ সাহেব বলেন, তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার দাদা হযরত বরকত আলী কাদিয়ানী সাহেবের মাধ্যমে। তার দাদা এবং দাদী দু'জনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, তারা এ সম্মান লাভ করেন। সৈয়দা মাজিদ সাহেবা দীর্ঘ দিন জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। প্রথমে হালকার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী মাল হিসেবে, অতঃপর ১৯৮২ সাল থেকে ফয়সালাবাদ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নুতনভাবে বিন্যস্ত হওয়ার পর সেক্রেটারী মাল হিসেবে ৭ বছর সেবা প্রদান করেছেন। অনেক পরিশ্রমের সাথে ৮২টি মজলিসে নিয়মিত সফর করে প্রত্যেক মজলিসের কর্মকর্তাদের কাজের নিগরানী করতেন। মাল বিভাগের সঠিক রেকর্ড আর আয় ও ব্যায়ের বিষয়ে সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তার পূর্ববর্তী জেলা সদর বুশরা সামী সাহেবা বলেন, একবার জামা'তী সফর শেষে ডাকাতদল তাদের গাড়ি আটকায়। তিনি দ্রুত চাঁদার যে পার্স ছিল তা পায়ের দিকে ফেলে দেন যেন চাদার অর্থ নিরাপদ থাকে কিন্তু নিজের অন্যান্য অলংকার হারানোর কোন পরোয়া তিনি করেননি। অন্যান্য অলংকারাদি ডাকাতরা নিয়ে নেয়, কিন্তু চাঁদার অর্থ নিরাপদ থাকে আর এ বিষয়ে তিনি অনেক আনন্দিত ছিলেন যে, চাঁদার অর্থ সুরক্ষিত আছে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে যতটুকুই অলংকার তার কাছে ছিল তার সবই জামা'তের বিভিন্ন খাতে দিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক অনেকবার পড়েছেন। অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। খোদা তা'লার ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিলেন, অত্যন্ত দোয়াগো এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিজ পুত্র, পুত্রবধূদের এবং পৌত্র-পৌত্রীদেরকে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রক্ষার এবং যুগ-খলীফার জন্য দোয়া করার আর যুগ খলীফার খুতবা শোনার জন্য তাকিদ প্রদান করতেন। মরহুমা ওসীয়তকারিণী ছিলেন। মৃত্যুকালে স্বামী ছাড়াও ৮জন পুত্র এবং বেশ ক'জন পৌত্র-পৌত্রী এবং প্রপৌত্র প্রপৌত্রী রেখে গেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা এই সব মরহুমদের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তাদের মর্যাদা উন্নীত করুন। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি নামাযের পর তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

*[**জিম্মি:** এটি ইসলামি আইনের একটি পরিভাষা। এ শব্দ দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের বুঝায়। জিম্মির আওতায় থাকা নাগরিকদের রাষ্ট্রকে জিযিয়া কর প্রদান করতে হয়। জিম্মিরা নিজস্ব আইন-কানুন পূর্ণরূপে মেনে চলতে পারে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে কিছু বিধিনিষেধও তাদের প্রতি আরোপিত হয়]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)